আমাদের সময়

তারিখ ..27 NOV..2015...
পৃষ্ঠা ..৭.. কলাম ...২...

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

বিশ্বজিত রায়

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করে বেসরকারি এই প্রতিষ্ঠানটি। পরীক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এই 'এডুকেশন ওয়াচ' রিপোর্টটি উপস্থাপন করে। তাদের গবেষণালব্ধ বিষয় থেকে জানা যায়, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা দিলেও বাকি ৪০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে অসদুপায় অবলম্বন করে। পরিদর্শকরা এসএমএসের মাধ্যমে হলের বাইরে থেকে প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করেন। এরপর প্রশ্নের উত্তর মুখে বলে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দিয়ে পরীক্ষার্থীদের সাহায্য করেন। পরীক্ষার্থীরা যেন একে অন্যের উত্তরপত্র দেখাদেখি করতে পারে সেই সুযোগও করে দেওয়া হয়। আড়াই ঘণ্টার প্রতিটি পরীক্ষার শেষ ৩০-৪০ মিনিট পরীক্ষার হলে এক ধরনের অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় পরীক্ষার্থীরা একে অন্যের সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে নেয় ও দেখে দেখে লিখে। শুধু তাই নয়, পিএসসি পরীক্ষার নিবন্ধনের সময়ই দুর্বল পরীক্ষার্থীদের সবলদের মাঝখানে রেখে তালিকা তৈরি করা হয়। আর পরীক্ষকরাও বেশ দয়ালু মনোভাব নিয়ে পিএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন। অন্যদিকে চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষায় যারা ভালো করতে পারে না তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে কোচিং-প্রাইভেট পড়ানোর প্রতিজ্ঞা করিয়ে বিদ্যালয়গুলো পঞ্চম শ্রেণিতে উন্নীত করে। পিএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর ৮৬.৩ শতাংশ বিদ্যালয় কোচিং ক্লাসের আয়োজন করেছিল। তবে ২২.৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা কোচিংয়ে আলাদা ফি নেন বলে স্বীকার করেছেন। ফি নেওয়ার দিক থেকে কিন্ডারগার্টেন সবচেয়ে এগিয়ে। যে পরীক্ষার্থী যত বেশি ঘণ্টা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়েছে তার সমাপনী পরীক্ষার ফল তত বেশি ভালো হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় ৭ হাজার ৭৩৯ টাকা এবং কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষার্থীদের গড় ব্যয় ১৮ হাজার ৮০৭ টাকা। ২০০৮ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে ব্যক্তি খাতে শিক্ষা ব্যয় বেড়েছে ১.০৩ শতাংশ এবং কোচিং ও প্রাইভেট খাতে বেড়েছে ১.৬১ শতাংশ।

শিক্ষার বর্তমান হালচাল মেধা যাচাইয়ে কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। শিক্ষার হার বাড়াতে যে পদ্ধতি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে ভবিষ্যৎ অগ্রগতি কোন পথে অগ্রসর হবে তা সময়ই বলে দেবে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ঘিরে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বাসা বেঁধেছে। এ পরীক্ষাকে ঘিরে প্রাইভেট পড়ানো ও কোচিং বাণিজ্যের মহোৎসব চলছে সারা দেশে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধেক শিক্ষকই এ-সংক্রান্ত কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া শ্রেণিকক্ষ বা পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদের অনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা নামক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমটিকে পতিত করছে ঘৃণ্য জায়গায়। শিক্ষকদের প্রতি অভিযোগ রয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে তেমন একটা আগ্রহ দেখান না তারা। প্রধান উদ্দেশ্য থাকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ফুঁসলিয়ে কীভাবে নিজ কোচিং সেন্টারে নিয়ে আসা যায়। এটাকে বলা হয় কোচিং-বাণিজ্য। শিক্ষকরা এই কাজটি করে থাকে বাড়তি মুনাফা লাভের আশায়। একটা সময় ছিল যখন শিক্ষকদের মূল্যায়ন করা হতো মাস্টারমশাই হিসেবে। সমাজে উঁচু স্তরে ছিল তাদের অবস্থান। আজকের শিক্ষক সমাজ সে জায়গায় নেই। শিক্ষক নামের মহান পেশাটিকে তারা কলঙ্কিত করছেন নানাভাবে। সরকারি এই সম্মানসূচক পেশাটি শিক্ষকদের কাছে অনেকটা গুরুত্বহীন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে শিক্ষকরা ঝুঁকছেন কোচিং-বাণিজ্যে। আর এটাকেই তারা বাড়তি অর্থ কামানোর প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছেন। কোচিং-বাণিজ্য বর্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে আকৃষ্ট হচ্ছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা। নিজ সন্তানকে পড়ার টেবিলে নিয়ে বসার পরিবর্তে কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছেন অভিভাবকরা। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে সরকারকে। কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে কোচিং ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। বর্তমান আলোকে প্রবাদটির যথার্থ মূল্যায়ন খুঁজে পাওয়া ভারি মুশকিল। যেখানে প্রথম শিক্ষাজীবনের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় সেখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঝড়ের বেসামাল পূর্বাভাস। শিক্ষাজীবনের সূচনালগ্নেই খুদে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে অনৈতিক সব কর্মকাণ্ড। যে শিক্ষাঙ্গনকে শিক্ষার উর্বর ভূমি কিংবা উত্তম ক্ষেত্র হিসেবে ধরে নেওয়া হয় সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এমন নীতিবিবর্জিত অবস্থা দেখে শিক্ষার প্রতি কারও অনীহা চলে আসবে না তো! বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি সে পথটি যেন বাতলে দিচ্ছে। আর আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা নামক মূল্যবান জ্ঞানসম্পদটি কীভাবে নষ্টামির সর্বোচ্চ সীমায় আরোহণ করছে। 'এডুকেশন ওয়াচ'-এর গবেষণায় প্রাথমিক শিক্ষার যে চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে তা দেখে শিক্ষাপ্রিয় সব মানুষ ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে এই উপবৃত্তির আওতা বাড়ছে। শিগগিরই শতভাগ শিশু উপবৃত্তির আওতাভুক্ত হচ্ছে। স্কুলে ৮৫ শতাংশ উপস্থিতি, সব পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়াসহ কয়েকটি শর্ত রক্ষা করতে পারলেই শিশু শিক্ষার্থীরা এর আওতায় আসবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে তাদের প্রস্তাবনা পাঠিয়েছে। শিক্ষার মান যাই হোক উপস্থিতি বেড়েছে প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে। ২০১৩ সালে একসঙ্গে ২৬ হাজার ১৯৩টি নিবন্ধিত প্রাথমিক স্কুলকে জাতীয়করণ করে সরকার। আগে দেশে ৩৭ হাজার ৬৭২টি সরকারি প্রাথমিক স্কুল ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর সূত্র মতে, এসব স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে। দুই ধরনের বিদ্যালয়ে এসএসসি পাস করা শিক্ষক আছেন ৫৪ হাজার ৮৪১ জন। তাদের মধ্যে পুরনো স্কুলে ২৬ হাজার ২৩০ জন; আর নতুন স্কুলে আছেন ২৮ হাজার ৬১১ জন। এইচএসসি পাস করা ৯৬ হাজার ৪৬ জন শিক্ষকের মধ্যে পুরনো স্কুলে ৫৬ হাজার ১২৫ জন এবং নতুন স্কুলে ৩৯ হাজার ৯২১ জন আছেন। স্নাতক বা সমমান পাস করা শিক্ষক আছেন ৯৯ হাজার ৯৪৬ জন। এর মধ্যে সিংহভাগ ৭৯ হাজার ৭৬১ জন শিক্ষক আছেন পুরনো স্কুলগুলোয়। আর নতুন স্কুলে আছেন ২০ হাজার ১৮৫ জন। মাস্টার্স ও সমমান পাস করা শিক্ষক আছেন ৬০ হাজার ৭৫৭ জন। এর মধ্যে পুরনো স্কুলে ৫৬ হাজার ৫৫ জন এবং নতুন স্কুলে আছেন মাত্র চার হাজার ৭০২ জন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অনেকে নামমাত্র পাস করে পোষ্য কোটায় চাকরি পেয়ে যাচ্ছেন। যারা একাধিকবার পরীক্ষা দিয়ে কোনো রকম সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন তারা ছোট্ট শিশুদের পাঠদানে কতটুকু শিক্ষা দিতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। শুধু পিতা-মাতার সরকারি চাকরি ও মুক্তিযোদ্ধা কোটার বদৌলতে সহজেই শিক্ষক নামের মহান পেশায় যুক্ত হচ্ছেন অযোগ্য অনেক প্রার্থী। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা পিছিয়ে পড়ার কারণ হিসেবে সদ্য জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক স্কুলগুলোকে দায়ী করা হয়েছে। সেখানে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে। বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই। পাঠদানসহ স্কুলের নানা কর্মকাণ্ডে সেসব স্কুল পিছিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা খারাপ ফল করছে। কোচিং বেআইনি হলেও ২০০৯ সাল থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা চালুর পর তা বেড়েছে। গাইড বইনির্ভর হয়ে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা মূল্যায়নে দেখা গেছে, জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ নেই। স্কুলগুলোর অবকাঠামোও পর্যাপ্ত নয়। অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীর হার অনেক কম। নানা কারণে দুই ধরনের প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে। ফলে গত এক বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। গত দুই বছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৩ সালে সরকারি স্কুলে পাসের হার ছিল ৯৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। আর জাতীয়করণকৃত স্কুলে ৯৭ দশমিক ৪৫ শতাংশ। ২০১৪ সালে পাসের হার পুরনো স্কুলে ৯৮ দশমিক ৩০ শতাংশ এবং নতুন স্কুলে ৯৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ। মানদণ্ড বিচারে পুরনো সরকারি স্কুলের শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে ভালো ফল করে।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'সনদ দেওয়ার নামে প্রাথমিক সমাপনী নিয়ে বৈষম্য দূর করতে গিয়ে আরও বৈষম্য তৈরি করছি কিনা বিষয়টি দেখতে হবে। শিক্ষার বৈষম্য দূর করতে এগিয়ে আসতে হবে সমাজকে।' প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত খুদে শিক্ষার্থীরাই একদিন উচ্চশিক্ষার পথে পা বাড়াবে। শিক্ষাজীবনের শুরুতেই যদি হোঁচট খায় এসব শিক্ষার্থী তাহলে ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রা কতটুকু সফল হবে তা নিয়ে ভাবতে হবে। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যত্নশীল হতে হবে শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকারকে। মনে রাখতে হবে একটি শিশু আগামী দিনের সম্পদ। তাই দেশ ও জাতি গঠনে আগামীর শিক্ষাযাত্রায় যাতে তারা যুগোপযোগী শিক্ষায় গড়ে উঠতে পারে, সেই নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার এমন প্রত্যাশাই রইল।

লেখক : কলামনিস্ট